মোমিনের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে পুলিশ শুধু দুর্নীবাজই নয়, খুনী ও সন্ত্রাসীও বটে। অবশ্য পুলিশের এই ভূমিকা নতুন নয়। এই দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী দিয়ে সরকার কিভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেবে...

সন্ত্রাসী নয় পুলিশই এখন সাক্ষাৎ যম

নিহত কলেজ ছাত্র মোমিন

রফিক মজুমদার

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানীর কাফরুলে সন্ত্রাসীদের বুলেট কেড়ে নিয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্র কামরুল ইসলাম মোমিনের (২২) প্রাণ। নিহতের বাবা আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার দিন রাতেই ২৬ সন্ত্রাসীর নামে কাফরুল থানায় মামলা ঠুকেছেন। যার প্রধান আসামি মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একেএম রফিকুল ইসলাম। পুলিশি সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতায় মোমিন হত্যাকান্ড সময়ের আলোচিত ঘটনার অন্যতম। এই অপ্রত্যাশিত হত্যাকান্ডের কারণে দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাদের বিত্তবৈভবের আরেকটি খতিয়ান জানার সুযোগ হলো জনগণের। ইব্রাহীমপুরের এ জমি ছাড়াও ঢাকাতে ওসি রফিকের রয়েছে আরো ৪-৫টি প্লট। বিশাল বিত্তবৈভবের মালিক ওসি যখন জমির বিরোধ নিয়ে মোমিন হত্যাকান্ডের প্রধান আসামি হলেন তার তিন দিন পরেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) দুর্নীতি ডাটাবেজ ২০০৪ রিপোর্টে পুলিশকে চিহ্নিত করা হলো দেশের শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসেবে।

হত্যাকান্ডের নেপথ্যে...

সরজমিনে ঘুরে জানা গেছে, মতিঝিল থানার ওসি একেএম রফিকুল ইসলাম বহুদিন থেকে সপরিবারে ইব্রাহীমপুর এলাকায় বসবাস করছেন। পাঁচ বছর আগে ১৫৪ উত্তর ইব্রাহীমপুরে আড়াই কোটি টাকা দিয়ে প্রায় দুই বিঘা জমির একটি প্লট কেনেন ওসি রফিকুল ইসলাম। প্রথমে জমিটি দুই দলিলে স্ত্রী এবং শ্বশুরের নামে ক্রয় করে পরে তা নিজের নামে নিয়ে নিয়েছেন। নিহত মোমিনের বাবা আব্দুর রাজ্জাক জানান, ওসি রফিকুল ইসলামের ঐ জমিটি তাদের ১৫৫ নম্বরের পাশের জমি। জমিটি ক্রয়ের পর থেকেই ওসি রফিক সীমানা প্রাচীর নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে। পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানা রকম কৌশলে লিপ্ত হয়। প্রথম দিকে ওসি নিজেই তাদের হুমকি দিতেন। পরে বছর চারেক চুপ থাকার পর ২০০৫-এর প্রথম থেকে এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োজিত করেন। বেশ কয়েক দফা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে রেখে তাদের বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভেঙেও দেন। শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের সেকেন্ড ইন কমান্ড তাজ গ্রুপের সক্রিয় সদস্যদের দেখে তখন কিছুই বলা যেত না। এ বিষয়ে নিহতের পরিবার থানা পুলিশ, কমিশনার, র‍্যাব এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও লিখিতভাবে অবহিত করেছেন। নিহতের বড় ভাই সাইফুল ইসলামের কাছ থেকে জানা যায়, মাস তিনেক আগে সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের সেকেন্ড ইন কমান্ড তাজ নিজে তাদের বাসায় ফোন করে বলে, ওসি রফিক আমার বড় ভাই, তার সঙ্গে কোনো ঝামেলা করবি না, করলে চরম মূল্য দিতে হবে। তাজ বলে আমি ভারতে থাকলেও আমার নিয়োজিত সদস্যরা সার্বক্ষণিক তোদের চারপাশে রয়েছে। তোদের ৬ ভাইকে শেষ করতে আমার একটি নির্দেশ এবং ৬টি গুলিই যথেষ্ট। তাজের কণ্ঠ থেকে এসব ভয়ঙ্কর কথা শোনার পর মোমিনের পরিবার ঘাবড়ে যায়। থানায় জিডিও করে। নিহত মোমিন ছিল তাদের ৬ ভাইয়ের মধ্যে সবচাইতে মেধাবী। সন্ত্রাসীরা মোবাইলে প্রায়ই বলতো মোমিন নামের শিক্ষার আলোটি তাদের প্রথম টার্গেট। এরপর পর্যায়ক্রমে সবাইকে মারা হবে। মোবাইলে এই হুমকি শোনার পরই মোমিনকে দেশের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গ্রামের বাড়িতে ১ মাস ১৩ দিন থাকার পর গত ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মোমিন ঢাকায় ফিরে

দেয়ালের একপাশে বৃত্তাকার চিহ্নের ২ বিঘার প্লটটি ওসি রফিকের। অপরপাশে ট্যাক্সিক্যাব রাখা ছোট প্লটটি মোমিনদের। ওসি রফিক ঐ জমিটুকুও দখল করতে চায়

আসে। সকালে ক্লাস থাকায় ৭টার মধ্যেই কমার্স কলেজের উদ্দেশে বের হয়। ঘর থেকে বের হয়ে কয়েক গজ পার হতেই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মোমিনকে গুলি করে। নিহত পরিবারের কাছ থেকে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বার মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। ক্রসফায়ারে পড়ার কয়েকদিন আগে সন্ত্রাসী পনু, শাহ আলম, জিয়া, জাফর, আলমাছ নামের পাঁচ যুবক নিহতের ১৫৫ উত্তর ইব্রাহীমপুরের বাসায় গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে। ওসি রফিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সন্ত্রাসীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। মাত্র কয়েকদিন আগেও সন্ত্রাসীরা ৫ লাখ টাকা দেয়ার জন্য আল্টিমেটাম বেঁধে দেয়। কোনো কিছুতেই নিহতের পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে মাথানত করেননি। ক্রসফায়ারে নিহত পনু মাস দুয়েক আগে দল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় নিহতের বাড়িতে আসে পাঁচ লাখ টাকার জন্যে। এ সময় সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঐ বাড়িতে র‍্যাব অভিযান চালায়। সব সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলেও পনুকে ধরে ফেলে র‍্যাব। এরপর র‍্যাবের হেফাজতে থেকে ঐ রাতেই ক্রসফায়ারের শিকার হয় সন্ত্রাসী পনু। মূলত এরপরই নিহত মোমিনের পরিবারে নেমে আসে অজানা আতঙ্ক। এ ঘটনার পর তাজবাহিনী পরিবারটির সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। নিহতের বড় ভাই সাইফুল ইসলাম জানান, সন্ত্রাসী পনুর ক্রসফায়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের হাতে পাঁচ লাখ টাকা দেয়ার কথা বলে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তারা কয়েক যুগ ধরে এলাকায় শান্তিতেই বসবাস করে আসছেন। ওসি রফিক জায়গাটি কেনার পরই তাদের জীবন যেনো বিভীষিকাময় হয়ে গেল। নিহতের পরিবারটির অভিযোগ, ওসিই তাজবাহিনীর পৃষ্ঠপোষক। সন্ত্রাসীরা ওসি রফিকের নির্দেশে মোমিনকে হত্যা করেছে।

কে এই ওসি

১৯৮৫ সালে পুলিশ বাহিনীতে এসআই পদে চাকরি নেন একেএম রফিকুল ইসলাম। ১৯৯৭ সালে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পান। এরপর থেকে জোট সরকার এক শীর্ষ নেতা এবং বর্তমান কমিশনারের নাম ভাঙিয়ে ঘুরেফিরে ডিএমপিতেই রয়ে গেছেন। গুরুত্বপূর্ণ থানা, ডিবি কিংবা সিআইডিই ছিল তার কর্মস্থল। ২০০২ সালে সিআইডি থাকাকালে রাজধানী জুরাইনে শিল্পপতি আলম হত্যাকান্ডের তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অপবাদ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। খিলগাঁওয়ে চারুকলার ছাত্রী মিমি আত্মহননের ঘটনায় একবার ক্লোজড ছিলেন ওসি রফিক। এ ছাড়াও ওসি রফিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হত্যাকান্ড, প্রকাশ্যে ঘুষগ্রহণ, আসামিদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত মালামাল আত্মসাৎ, শীর্ষস্থানীয়

ঘাতক ওসি রফিকুল ইসলাম

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক বড় ধরনের ডাকাতির কাজে সহায়তা ও খুনের অভিযোগ রয়েছে। ২০০২ সালে সিমি হত্যার কারণ হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ওসি রফিককে সিআইডিতে পাঠানো হয়েছিল। সিআইডিতে গিয়ে ওসি রফিক আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। যার ফলে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান ওসি রফিক। শিল্পপতি আলম হত্যাকান্ডের সময় সিআইডিতে থেকে তিনি তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছেন। ২০০৪ সালে ঢাকার কর্ণফুলী গার্ডেন সিটিতে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতির সঙ্গে জড়িতরাও রিমান্ডে ওসি রফিকের জড়িত থাকার কথা বলে। ঐ ঘটনায় আরো যাদের নাম উঠেছিল তাদের ৩ জন কয়েকদিনের মাথায় গুলশান এবং মোহাম্মদপুরে খুন হয়। মোহাম্মদপুরে শাহীন, সেন্টু এবং গুলশান এলাকায় খুন হয় জাহিদুল। ঘটনার পর পুলিশ বিভাগে ব্যাপক তোলপাড় হয়। অভিযোগ ছিল, নিজেকে আড়াল করার জন্যে ওসি রফিক এসব হত্যাকান্ড ঘটায়। কিন্তু ওসি রফিকের বিরুদ্ধে ঐসব খুনের বিষয়ে জড়িত কি না এখন সেখানেই মাটি চাপা পড়ে আছে ঘটনাগুলো। ওসি রফিকের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় যোগদানের পরও রয়েছে অগণিত অভিযোগ। তার আমলে ফকিরেরপুলের আবাসিক হোটেলগুলোকে বানানো হয়েছে মিনি পতিতালয়। হোটেলগুলো থেকে মাসিক হারে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে ওসি রফিকের বিরুদ্ধে। তার আমলেই আরামবাগ ক্লাবপাড়া হয়েছে জুয়াড়িদের আস্তানা। পুলিশি পোশাক পরে ওসি রফিক ছিলেন অনেক এলাকায় সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক। ইব্রাহীমপুরে তার ক্রয় করা জমিটির কেয়ারটেকার হিসেবে ছিল এলাকার শীর্ষসন্ত্রাসী আলমাছ। ওসি রফিকের জায়গায় ঘর করে সন্ত্রাসী আলমাছ তার দলবলসহ নেশা এবং রাতে আমোদফুর্তি করে। সন্ত্রাসী আলমাছও মোমিন হত্যা মামলার আসামি। বর্তমানে পলাতক থেকে ওসির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে নিহতের পরিবারকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিহত মনিরের বড় ভাই সাইফুল ইসলাম গত ৬ জুলাই কাফরুল থানায় একটি জিডি করেন। এতে জমির সীমানা নিয়ে ওসি রফিকুলের সঙ্গে বিরোধের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দিন জিডি গ্রহণকারী ডিউটি অফিসার এএসআই মোঃ আক্তারুজ্জামান বিষয়টি কাফরুল থানার ওসিকে না জানিয়ে ফেলে রাখেন। আর মনির নিহত হবার দুই দিন পর দায়িত্ব অবহেলার দায়ে এএসআই আক্তারুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তবে অভিজ্ঞমহলের মতে, ওসি রফিককে বাঁচাতে এসব করা হচ্ছে। জুলাই মাসে জিডি এন্ট্রির পর ব্যবস্থা নেয়া হলে আজ নিহত মনিরের মাকে বুক চাপড়ে বলতে হতো না, 'যেই মাটির জন্য মনির খুন হইছে, সেই মাটিতেই তারে কবর দিছি।' এদিকে নিহত মনিরের পরিবার সন্ত্রাসীদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি সামাজিকভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তার ছোট ভাই অসুস্থ শুনেও কোনো ডাক্তার তার চিকিৎসা করতে আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে আসতে রাজি হয়নি।

ওসি রফিকের খুঁটির জোর...

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ওসি রফিক প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর নিকটাত্মীয় পরিচয় দিয়ে দাপটের সঙ্গে ডিএমপি চষে বেড়াচ্ছেন। মন্ত্রীর ছোটভাই কমিশনার তার অতি কাছের মানুষ এবং বন্ধু বলে পরিচয় দেন তিনি। এ দাপটে অনেক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকেও তিনি থোরাই কেয়ার করতেন। এ জন্যে অনেক পুলিশ কর্মকর্তা ওসি রফিকের ওপর বিরক্ত ছিলেন। জানা গেছে, সবাই ঐ প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং ছোট ভাইয়ের ভয়ে সাহস পেতেন না। মূলত এ কারণেই খুনের মামলার প্রধান আসামি হওয়ার পর এখনও বহাল তবিয়তে আছেন ওসি রফিক। ঐ বিশেষ স্থান থেকে নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আইনের শাসন অন্ধের ভূমিকা পালন করবে। আইন এখন ঐ প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং তার ছোট ভাইয়ের নির্দেশের অপেক্ষায়। নির্দেশ মাত্র গ্রেপ্তার করা হবে খুনের প্রধান আসামিকে। ক্লোজড হওয়ার পর ৯ আসামিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে পুলিশ ছিল এক ভূমিকায় আর ওসি রফিকের বেলায় আবার অন্য ভূমিকা।

পুলিশ করবে পুলিশের তদন্ত!

চোরে চোরে যদি হয় খালাতো ভাই তবে কে কার বিরুদ্ধে বলবে! অতীতে অনেক ঘটনা এ দেশের বিচার ইতিহাসে রয়েছে যেখানে পুলিশ দিয়ে পুলিশি অপরাধের তদন্ত করার কারণে মাঝপথে তদন্ত মাটি চাপা পড়ে গেছে। পুলিশের মাধ্যমে কখনো পুলিশের তদন্ত হওয়া ঠিক না বলে মত পোষণ করেছেন বিজ্ঞজনরা।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**